পঞ্চম অধ্যায়

‘পূর্ব-পশ্চিম’ : পূর্ব ও পশ্চিমে দ্বিখন্ডিত বাঙালীর পূর্ব থেকে পশ্চিম গোলার্ধে শিকড় সন্ধানের ইতিহাস

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ‘সেই সময়’ উপন্যাস থেকে বাঙালী সংস্কৃতির প্রবাহ পথকে খোঁজার যে সচেতন প্রয়াস শুরু করেছিলেন, সেই প্রবাহ সমৃদ্ধ হয়েছে ‘পূর্ব-পশ্চিম’ উপন্যাসের বিস্তীর্ণ পরিসরে। উনিশ শতকের আত্মপ্রতিষ্ঠিত বাঙালী হৃদয়ে বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই প্রবল হয়েছিল পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করার স্বপ্ন। কিন্তু ১৯৪৭ -এর দেশভাগ বিদীর্ণ স্বাধীনতা বাঙালীকে দ্বিখন্ডিত করল, বাঙালী হৃদয়ের দীর্ঘ লালিত

স্বাধীনতার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশ নেতাদের আচরণ দেশবাসীর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশাকে নিয়ে গেল বিনষ্টির পথে। স্বাধীনতা উত্তর পর্বের বাংলার সমাজ সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাসকেই ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের বিস্তীর্ণ পরিসরে। এই বাংলা আর উনিশ বিশ শতকের অখন্ড বাংলা নয়, এই বাংলার মাঝখানে সাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করে উঠে গেছে কাঁটা তারের বেড়া। দুই বাংলার বাঙালী ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে। পশ্চিমের দেশগুলির মূলস্রোতে ঢুকে পড়তে শুরু করেছে বাঙালী। 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের কাহিনীর সূচনা পঞ্চাশের মধ্যভাগে, কাহিনীর সমাপ্তি আশির দশকের মোহনায় এসে। এই চারটি দশক জুড়ে দুই বাংলার তথা বাঙালী জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইতিহাসের ওঠা পড়াকে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক, বাঙালীর সাংস্কৃতিক প্রবাহের ইতিহাসে খুঁজেছেন নিজের শিকড়কে। 'পূর্ব-পশ্চিম' নামটি উপন্যাসে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রবাহ; পূর্ব গোলার্ধ ও পশ্চিম গোলার্ধের বৃহত্তর পটভূমি উপন্যাসে এসেছে। আবার মানুষের জীবনে ও মনে যে পূর্ব ও পশ্চিম, তার প্রবৃত্তি ও সামাজিক সত্তার যে দ্বন্দ্ব, মন ও মননে দেবতা ও দানবের একত্র সহাবস্থানই মানুষের মনুষ্যত্ব, এই দুইয়ের যে দ্বন্দ্ব তাও উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। অধ্যাপক উজ্জ্বল কুমার মজুমদার লিখেছেন, "উনিশ শতক যেমন বাঙালির জীবনে নানান টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশের কাল, বিশ শতকের মধ্যভাগে দেশভাগ-পরবর্তী পঞ্চাশ থেকে আশির দশক শুধু পূর্ব পশ্চিমে ভেঙে যাওয়া বাঙালির জীবনের ওলট পালটের কালই নয়, পূর্ব পশ্চিমে অর্থাৎ এই পূর্ব গোলার্ধ ছেড়ে পশ্চিম গোলার্ধে ইউরোপ আমেরিকায় ছড়িয়ে যাওয়ারও কাল, সুনীল নিজেও যে কালস্রোতে পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন।... পূর্ব বাংলা, পশ্চিমবাংলা এবং পশ্চিম মহাদেশ এই ত্রিমাত্রিক পটে

পূর্বপশ্চিম উপন্যাস লেখা। বিভক্ত দুটি দেশ এবং বিদেশের বিশালভূমিতে ‘অনেক’ চরিত্রই গুরুত্ব পেয়েছে – ‘এক নায়কতন্ত্র’ নয়।”[১]

‘পূর্ব-পশ্চিম’ ঔপন্যাসিকের চোখে দেখা ইতিহাস। নিজের জীবনের ফেলে আসা সময়কেই তিনি গ্রহণ করেছেন উপন্যাসের প্লটে, ‘সেই সময়’ বা ‘প্রথম আলো’র মত সার্বিক ইতিহাস নির্ভরতা এখানে নেই। ‘লেখকের কথা’ অংশে তিনি জানিয়েছেন, “এই উপন্যাসের পশ্চাৎপটে আছে সমসাময়িক ইতিহাস, বেশ কিছু রাজনৈতিক পালাবদল, কিছু আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বকে উপস্থিত করা হয়েছে সরাসরি। এইসব তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও বহু গ্রন্থ থেকে। কোনও কোনও আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দিয়েছি, যেমন জাহানারা ইমামের পারিবারিক ঘটনাটি আমি পেয়েছি তাঁর যুদ্ধকালীন ডায়েরি থেকে, যা পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।... ’৬৫-র যুদ্ধের সময়ে আমি ঢাকা শহরে ছিলাম না। তৎকালীন পরিবেশের বিবরণ আমি পেয়েছি কয়েকটি গ্রন্থে।”[২] যে সামাজিক ইতিহাসের সাক্ষী সুনীল নিজে, সেই সময়কে চিত্রিত করতে গিয়ে উপন্যাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে আত্মজৈবনিক উপাদান। দ্বিখন্ডিত বাঙালীর ছিন্নমূলতার বেদনা, দুই বাংলার উদ্বাস্তু মানুষের হাহাকার, ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ ১৯৬২, নেহেরুর মৃত্যু ১৯৬৪, লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অকালপ্রয়াণ ও ইন্দিরা গান্ধীর অভ্যুত্থান ১৯৬৪, ভারতের অর্থনৈতিক বিপর্যয়, কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন ১৯৬৪, মৌলবাদের প্রাধান্য থেকে বেরিয়ে এসে পূর্ব বাংলার বাঙালীদের বাংলা ভাষার জন্য জীবন দান ১৯৫২, মুক্তিযুদ্ধে হাজার হাজার বাঙালী যুবকের নির্ভীক সংগ্রাম, পশ্চিম বাংলার বহু তাজা প্রাণের নক্সাল আন্দোলনের আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়া, আশির দশক থেকে বাঙালীর পূর্ব থেকে পশ্চিম গোলার্ধে ছড়িয়ে পড়া, মূলের থেকে দূরে গিয়েও চরিত্রগুলির শিকড়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণের চিত্র ‘পূর্ব-পশ্চিম’এ

ছড়িয়ে আছে। 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের ঘটনাক্রম ১৯৫৫ সাল থেকে হলেও চেতনার প্রবাহে অতীত বর্তমান ভবিষ্যত একাকার হয়েছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মভূমি পূর্ববঙ্গ, তাঁর আত্মজীবনী 'অর্ধেক জীবন' -এর অনেকটা জুড়ে রয়েছে তাঁর পূর্ববঙ্গের শৈশব স্মৃতির রোমন্থন। শুধুমাত্র ধর্মের কারণে বাঙালীর দুই খণ্ডে ভাগ হয়ে যাওয়াকে কোন দিন মেনে নিতে পারেননি সুনীল, তাঁর স্বপ্নের দেশ ছিল অবিভক্ত বাংলাদেশ। সাহিত্যিক হিসাবে শীর্ষে পৌঁছনোর বহুপূর্ব থেকেই পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের আশা তাঁর হৃদয়ে ছিল প্রবল। প্রথম সংখ্যা 'কৃত্তিবাস' সম্পাদকীয়তে তিনি বলেছিলেন "বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে পাকিস্তানের কবিদের স্থান প্রায় অনুল্লেখ্য। তাতে কোন দুঃখ থাকত না যদি তাঁদের মধ্যে কেউ আশ্চর্য সার্থক কবিতাও লিখতেন। বাংলাদেশের শারীরিক মানচিত্রের মত কাব্যের মানচিত্রও খণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু উভয়বঙ্গে বাংলাভাষার পূর্ণ অধিকার সম্পর্কে যেন আমাদের কোনদিনও সন্দিগ্ধ না হতে হয়। পাকিস্তানের তরুণ কবিরা আমাদের সমদলীয়, সহকর্মীও। এ সংখ্যায় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হল না, কিন্তু আগামী সংখ্যায় আমরা নিশ্চয় সক্ষম হব।"[৩] একজন সদ্য যুবকের কলমে এই চেতনার প্রকাশ প্রমাণ করে বাংলা ও বাঙালীত্ব তাঁর সত্তার সঙ্গে ঠিক কতখানি জড়িয়ে আছে। 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের কাহিনীতে পাশাপাশি বয়ে চলেছে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ।

পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড উৎসর্গ করেছেন তাঁর বাবা কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়কে। উপন্যাসে বহু চরিত্র গুরুত্ব পেলেও অন্যতম প্রধান চরিত্র প্রতাপ সুনীলের পিতারই স্মৃতিবাহী। প্রতাপ চরিত্রকে কেন্দ্র করেই এই উপন্যাসে উঠে এসেছে দেশভাগ। পূর্ববঙ্গের মালখানগর। প্রতাপ চরিত্রটিকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের অন্য চরিত্রগুলো যুক্ত হয়েছে কাহিনীসূত্রে। উপন্যাসে কোনো বিশেষ চরিত্র প্রধান চরিত্রের মর্যাদা পায়নি, কিন্তু উপন্যাসের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সবসময়েই কেন্দ্রে

থেকেছেন প্রতাপ মজুমদার, পূর্ববঙ্গের মালখানগরের স্মৃতি তাড়িত এই চরিত্রটি গোটা উপন্যাস জুড়েই বহন করেছেন ছিন্নমূল হওয়ার বেদনা, কাহিনীবৃত্তে মিলে মিশে গেছে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ওঠা-নামা নিয়েই। নিজের আত্মজীবনী 'অর্ধেক জীবন' -এ সুনীল লিখেছেন, "আমার বাবা দেশভাগ কিছুতেই মানতে পারেননি। তাঁর মতে, এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব, ইংরেজরা তাড়াহুড়ো করে কাটা ছেঁড়া করে দিয়ে গেছে, দেশের মানুষ আবার মিলেমিশে যাবে, মুছে ফেলবে এই কৃত্রিম সীমারেখা, বারবার জোর দিয়ে তিনি বলেছিলেন এই কথা, এবং আমৃত্যু তাঁর এই বিশ্বাস ছিল।"[৪] উপন্যাসে প্রতাপ মজুমদারের বাবা ভবদেব মজুমদারেরর মধ্যেও এই বিশ্বাসের অনুবর্তন দেখা গেছে, পূর্ববঙ্গকে তিনি ছাড়তে পারেননি, ঔপন্যাসিক লিখেছেন, "হিন্দুস্তান পাকিস্তান তাঁর কাছে অবাস্তব মনে হত। এতকালের চেনা মানুষ কখনো হঠাৎ শত্রু হয়ে যেতে পারে? পিতৃপুরুষের ভূমি ছেড়ে কেউ চলে যায়?... শ্রী অরবিন্দ নাকি ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, দশ বছরের মধ্যে ভারত পাকিস্তান এক হয়ে শুরু হবে নতুন ইতিহাস।"[৫] মালখানগর ছেড়ে যখন সমস্ত আত্মীয় বন্ধু চলে আসছিলেন কলকাতায় তখন ভবদেব মজুমদার জলের দামে কিনে রেখেছিলেন তাদের বাড়িঘর সম্পত্তি, আশ্বাস দিয়েছিলেন, ফিরে এলে এই দামেই তাদের সবকিছু ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যদিও তার এই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। ঔপন্যাসিক লিখেছেন, "পিতৃশ্রাদ্ধ করতে গিয়ে প্রতাপ বুঝতে পেরেছিলেন এবার চিরকালের মতন মালখানগরের পাট তুলতে হবে... ভবদেব মজুমদার তাঁর যে সব নতুন বাড়ি জমি কিনে রেখেছিলেন সে সব তো ছাড়তে হলই, তাঁদের নিজস্ব বসতবাড়ি ও পুকুর বাগানের জন্যও খদ্দের পাওয়া গেল না। যা কিছুদিন পর এমনিই পাওয়া যাবে সাধ করে তা আর কে পয়সা দিয়ে কিনতে চাইবে।"[৬] মালখানগরের পাট ওঠার পর প্রতাপের মা সুহাসিনী দেবী তাদের দেওঘরের বাড়িতে মেয়ে শান্তি ও জামাই বিশ্বনাথ গুহকে নিয়ে প্রকৃতির কোলে শুরু করেছেন

নতুন জীবন, কলকাতার শহুরে পরিবেশে তিনি মানিয়ে নিতে পারেননি। দেশভাগ এই প্রৌঢ়া বিধবা রমণীকে করেছে শিকড়চ্যুত।

উপন্যাসের প্রথম পর্বে প্রতাপ তার স্ত্রী মমতা, দুই ছেলে পিকলু, বাবলু(অতীন), প্রতাপের দিদি সুপ্রীতি, তার স্বামী অসিতবরণ, তাদের কন্যা তুতুল, প্রতাপের বৈমাত্র ভাই কানু, মমতার দাদা ত্রিদিব, তার স্ত্রী সুলেখা, সমাজসেবী আধুনিকা চন্দ্রা, অধ্যাপক অসমঞ্জ রায়, উদ্বাস্তু নেতা হারীত মণ্ডল, তার স্ত্রী গোলাপী, তাদের পুত্র সুচরিত, প্রতাপের বন্ধু বিমানবিহারী তার কন্যা অলি ইত্যাদি বহু চরিত্রকে কেন্দ্র করে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন স্বাধীনতা পরবর্তী কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ। বিশ্বনাথ গুহ, সত্যেন ভাদুড়ী, বুলা ইত্যাদি চরিত্রগুলিকে দেওঘরের প্রক্ষাপটে দেখিয়ে সময়ের সন্ধান করেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এদেশে জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে এসেছে, দেশকে আর কেউ জননী বলে মনে করেনি। দেশ হয়ে উঠেছে নিছক গ্রাসাচ্ছদনের পটভূমি। স্বাধীনতার পরবর্তীতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ছাটাই, ভোগ্যপণ্যের অভাব এবং অনটনের জন্যে ছাত্র ও যুবসমাজ জাতীয়তাবাদ ছেড়ে মার্ক্সবাদের দিকে ঝুঁকেছে। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র ও যুবশাখা ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সরকার বিরোধী মিছিল সমাবেশের ওপর লাঠি, গুলি ও টিয়ার গ্যাস চলেছে ব্রটিশ কায়দায়। গণতন্ত্র প্রতি পদে হয়েছে ধূলুন্ঠিত। মহাত্মা গান্ধীকে জাতির পিতা আখ্যা দিয়ে মাটির মূর্তি বানিয়ে রাখা হয়েছে।

উপন্যাসে প্রাণচঞ্চল বিশ্বনাথ রোজগারে অপারগ হলেও উদার এবং আনন্দপ্রিয়, টাকাপয়সার টানাটানি থাকলেও সকালবেলাতেই তা নিয়ে আলোচনা তিনি পছন্দ করেন না। নিজের সাধনা গান বিক্রি করে অর্থ উপার্জন তিনি করতে চান না। যদিও অর্থের অভাব এই রকম

আপনভোলা মানুষকেও পরিণত করেছে দালাল শ্রেণীর মানুষে। এই চরিত্রটির মধ্য দিয়েই ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক দুর্দশা কীভাবে বদলে দিয়েছিল মানুষকে, উপন্যাসে এই বিশ্বনাথ চরিত্রটির অধঃপতিত হওয়ার ঘটনার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন সমাজ মানসের অধঃপতনের স্বরূপকে। বিশ্বনাথ বলেছেন, "আমরা ছিলাম ল্যান্ডেড জেন্ট্রি, হঠাৎ ডিসক্লাসড হয়ে গেছি, তার মূল্য দিতে হবে না? নিজস্ব বাড়ি ছিল, জমিজায়গা ছিল, তার থেকে আয় ছিল, সেই ভরসাতেই গঠন করেছিলাম যৌবনকাল। সব মানুষ কি আর জীবিকার ধান্দায় ঘুরবে, কিছু কিছু মানুষ তো উৎকট খেয়াল নিয়েই থাকবে। এখন সেসব নেই, হঠাৎ সব খুইয়ে জীবনযুদ্ধে নেমে পড়লে পারব কেন? আমাদের মতন কিছু মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে! এটাকে নিয়তি বলতে পারো।"[৭] প্রতাপের দিদি সুপ্রীতির স্বামী অসিতবরণের চাকরি চলে যাওয়ার ঘটনার মধ্য দিয়েও ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন স্বপ্নের স্বাধীনতার স্বরূপ। উপন্যাসে অসিতবরণ "সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন, সেখানে ঘুষের রাজত্ব। অসিতদা একটা ঘুষের র‍্যাকেট ধরে ফেলে ছিলেন, ফুড মিনিস্টার প্রফুল্ল সেনের কাছে নোট পাঠাতে যাচ্ছিলেন। সেইসব ঘুষখোর কর্মচারীরা, তাদের মধ্যে দুজন জেলখাটা স্বদেশি, একটু আগে জানতে পেরে অসিতদার প্রাণের ভয় দেখাত, বাধ্য হয়ে, চাকরি ছাড়তে হয়। তারপর থেকেই ওঁর মাথায় গোলমাল দেখা যায়।"[৮] চাকরি যাওয়ার পর পৈতৃক কাশীপুরের বাগানবাড়ি উদ্বাস্তুরা দখল করলে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে হাতাহাতিতে মৃত্যু হয় অসিতবরণের। তার মৃত্যুর দায়ভার পড়ে উদ্বাস্তু নেতা হারীত মণ্ডলের ওপর। গ্রেপ্তার হতে হয় তাকে। স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুরবাড়িতে আর থাকতে পারেননি সুপ্রীতি। আশ্রয় নিয়েছেন প্রতাপের সংসারে।

প্রতাপের বৈমাত্র ভাই কানুও নানা অসৎ পথ গ্রহণ করে গড়ে তুলেছিল নিজের ভবিষ্যতের পথ। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন সময়ের স্বরূপ, "কানুর উপার্জনের পথটি পুরোপুরি অবৈধ নয়। বরং বলা যেতে পারে এক ধরণের ব্যবসার উদ্যোগ। সে কন্ট্রোলের শাড়ি কিনে এনে ফুটপাতের দোকানে বেচে দেয়।... প্রতি শাড়িতে দু'টাকা তিন টাকা মুনাফা। শাড়ি যখন সহজে পাওয়া যেতে লাগল, তখন কানু চলে এলো কয়লায়। কয়লারও রেশন। এখন দেশে প্রায়ই কোনও না কোনও প্রয়োজনীয় জিনিস বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। সরকার তখন সেগুলো কন্ট্রোল দরে দেবার চেষ্টা করে। সেটা একটা নিয়ম রক্ষা মাত্র, অতি অল্প লোকেই তা পায়। যারা পায় তাদের মধ্যেও আবার কানুর মতন মানুষই বেশী।"[৯] প্রতাপের সততার প্রতি করুণা করে কানু ভেবেছে, "সেজদা সবসময় সততার গর্ব করে, অশেষ দুঃখ আছে সেজদার কপালে। এই যুগটাই যে অন্যরকম।"[১০] প্রতাপের সততায় কিছুদিন একটা ব্যাঙ্কে চাকরি করে এসব থেকে দূরেও ছিল কানু, কিন্তু অচিরেই সেই ব্যাঙ্ক বন্ধ হলে কানুকে আবার বেছে নিতে হয় অসৎ পথ। যে জীবনে ছমাস জেল খাটতে হলেও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ বা সামাজিক প্রতিপত্তির অভাব থাকে না। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন সময়ের স্বরূপ, ডারইউনের যোগ্যতমের উদ্বর্তন এর তত্ব, স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে নীতি ও আদর্শের পথ থেকে ভ্রষ্ট হতে হয়েছিল মানুষকে।

স্বাধীনতার পর দ্বিধাবিভক্ত দুই দেশের কর্ণধার হয়েছিলেন দুজন বিলাত ফেরত শিক্ষিত ব্যারিস্টার। জহরলাল নেহেরু এবং মহম্মদ আলি জিন্না। যদিও জিন্না বেশিদিন ক্ষমতা ভোগ করতে পারেননি, তাঁর অকাল মৃত্যু হয়েছিল। ঔপন্যাসিক লিখেছেন, রাজার চার পাশে যেমন

মোসাহেবরা ঘিরে থাকে সেই রকমই কংগ্রেসি শাসকদের সঙ্গে জুটতে লাগল ধনী, সুযোগসন্ধানী ও অর্থলোভীর দল। পণ্ডিত নেহেরুর এটা পছন্দ নয় কিন্তু তিনি এদের ঝেড়ে ফেলতেও পারছেন না। যৌবনে তিনি সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছিলেন, একসময় ঘোষণা করেছিলেন যে সময় এলেই তিনি কালোবাজারিদের ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেবেন। ঔপন্যাসিক লিখেছেন "সময় যখন এল, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন ল্যাম্পপোস্টগুলো বোধহয় মজবুত নয়। ওদিকে আগে মনোযোগ দেওয়া দরকার।"[১১] স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষ বার বার জর্জরিত হয়েছে কালোবাজারিদের সৃষ্ট নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উধাও হওয়ার ঘটনায়। উপন্যাসে উঠে এসেছে এসব প্রসঙ্গও প্রাসঙ্গিকভাবে। কানু ব্যবসা করেছে কন্ট্রোলে শাড়ি কিংবা তেলের। বাজারে চালের দাম আকাশ ছুঁলে অমিল হয়েছে আতপ চাল, কিংবা চিনি পাওয়া না গেলে সাধারণ মানুষ ভোগ করেছে যন্ত্রণা।

দীর্ঘকাল ব্যাপী বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা ভারতবর্ষের রাজনীতিকে বিচলিত করেছিল। নেহেরু বিশ্ববাসীর কাছে সম্মানের আসন পেলেও এই উদ্বাস্তু সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারেননি, উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে সদর্থক কোনো পদক্ষেপ তিনি নিতে পারেননি। এই দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে তৈরী হওয়া রাষ্ট্রের সত্যতা তিনি মেনে নেননি। পাঞ্জাবের দিকটায় প্রথম প্রথম দাঙ্গা খুনোখুনি যা হবার হয়ে গেছে মাউন্ট ব্যাটনের আমলেই আগমন নির্গমন যা হওয়ার হয়ে গেছে, কিন্তু বাংলার দিকে আগমন নির্গমন বন্ধ হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। আত্মজীবনী 'অর্ধেক জীবন' -এ ঔপন্যাসিক লিখেছেন, "আমাদের ফরিদপুর অঞ্চলে ঠিক কি ধরনের দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়েছিল তা আমার স্মরণে নেই, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও ছিল না। তবে আমাদের আত্মীয় স্বজনেরা সবাই চলে এসেছিলেন। নিতান্ত

বাধ্য না হলে কি কেউ পিতৃ-পিতামহের ভিটে-মাটি ছেড়ে অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়? মাটির টান অতি সাংঘাতিক।... পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা ভারতের দিক থেকে কোনো সোনালি হাতছানি দেখতে পেয়ে এসেছিলেন তা নয়। ছিল না সাদর অভ্যর্থনার সামান্যতম ইঙ্গিত। বরং শরণার্থী হয়ে এসে তারা পেয়েছে উপেক্ষা, অবহেলা, বিদ্রূপ, অনেক ক্ষেত্রে প্রতিরোধ। তবু তারা এসেছে, বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে, পায়ে হেঁটে কিংবা নৌকায়।"[১২]

দেশভাগ পরবর্তী সময়ে ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আবার শুরু হয়েছিল ভয়াবহ দাঙ্গা। এসময়ে আবার শুরু হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীর ঢল। এত অনুপ্রবেশকারী মানুষকে সামলানোর ক্ষমতা তৎকালীন ভারতবর্ষের সরকারের ছিল না। ত্রাণ শিবির তৈরী হল যৎসামান্য। লক্ষ লক্ষ পরিবার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় উন্মুক্ত আকাশের নীচে, গাছতলায়, রেল স্টেশনে। দেশ ভাগের প্রথম তিন বছরের মধ্যেই কলকাতায় শরণার্থী সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় বাষট্টি লক্ষ। পশ্চিম বাংলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে নানা জায়গায় দাঙ্গা হয়েছিল, অনেক মুসলমানও এই রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তবে তাদের সংখ্যা ছিল তুলনায় অনেক কম। ১৯৫১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী গোটা পাকিস্তানে ভারত থেকে সত্তর লক্ষ মোহাজের বা শরণার্থী গিয়েছিল। তার মধ্যে তেষট্টি লক্ষই গিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছিল মাত্র সাত লক্ষ – তাঁর মধ্যে একটা বড় অংশ অবাঙালী মুসলমান। জওহরলাল নেহেরু ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের মধ্যে এক বৈঠকে দুদেশের সংখ্যালঘুদের বিষয়ে একটি চুক্তি হয়েছিল। দুই নেতা ঘোষণা করেছিলেন যে, দুটি রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুরা ধর্ম নির্বিশেষে নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার পাবে, তাদের জীবন, সংস্কৃতি ও সম্পত্তি রক্ষার আশ্বাস দেওয়া হয়, মত প্রকাশের ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতাও স্বীকৃত হবে। শুধু তাই নয়, দেশত্যাগী উদ্বাস্তুরাও ইচ্ছে করলে আবার ফিরে গিয়ে পৈতৃক

ভিটে মাটি বাড়ি ও সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে, এমন ব্যবস্থাও করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। যদিও পাকিস্তান এই চুক্তির তোয়াক্কা করেনি, বরং সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক কিছু কিছু আইন প্রণয়ন করে ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের দিকে এগিয়েছিল। প্রশাসনও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা রক্ষার দিকে উদাসীন ছিল। কোনও হিন্দু উদ্বাস্তুই পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে ফেলে আসা সম্পত্তির অধিকার চাইতে সাহস পায়নি। পাকিস্তানের কট্টর সমর্থকেরা সাধারণ মানুষদের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি করেছিল যে, হিন্দুদের কিছুটা ভয় দেখালেই তারা বাড়ি জমি ফেলে পালাবে আর সেগুলোকে দখল করে নেওয়া যাবে। যদিও ভারত থেকে মুসলিমদের দেশত্যাগের স্রোত এই চুক্তির ফলে অনেকটা কমে গিয়েছিল। কোথাও কোথাও এদেশেও মুসলমানদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হলেও এদেশে একটা গণতান্ত্রিক বাতাবরণ ছিল, ফলত একান্ন সালের জনগণনায় দেখা যায়, পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যার কুড়ি শতাংশ মুসলমান, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের সংখ্যা তুলনায় অনেক কম। নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তুদের ঢল অব্যাহত থাকায় দিল্লির লোকসভায় পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে হিন্দু মুসলিম জনগন বিনিময়ের প্রশ্ন উঠেছিল, কিন্তু এই ঘটনা অবশ্যই ছিল নেহেরুর আদর্শের বিরোধী এবং মানবতারও বিরোধী।

রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, আধপেটা খেয়ে, পুষ্টির অভাবে বিনা চিকিৎসায় লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু কীট পতঙ্গের মত জীবন যাপন করেছে, নারী শিশু কেনাবেচা চলেছে অবাধে, চলেছে অবাধ নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ, মনুষ্যত্বের এক চরম অবমাননা সাক্ষী থেকেছে ইতিহাস। নিঃস্ব রিক্ত উদ্বাস্তুরা কেউ কেউ দখল করতে শুরু করেছিল পরিত্যক্ত জমি, বাড়ি, ধনীদের বাগান বাড়ি। উপন্যাসে উদ্বাস্তু নেতা হারীত মণ্ডল প্রতাপের দিদি সুপ্রীতিদের সম্পত্তি কাশীপুরের বাগানবাড়ি দখল করলে তাদের সঙ্গে হাতাহাতিতে সুপ্রীতির স্বামী অসিতবরণের মৃত্যু হয়েছে। জীবন যুদ্ধে

লড়াই করতে করতে জেলে গেছে হারীত মণ্ডল। নিজের বিদ্রোহী মেজাজের জন্যে হয়েছে পুলিশের চোখে অপরাধী। উপন্যাসে হারীত মণ্ডলকে কেন্দ্র করেই দেখা গেছে সরকারি ক্যাম্পে উদ্বাস্তু মানুষদের প্রবল জীবন সংগ্রাম, সরকারের চরম অবহেলা, পুলিশের দমননীতি। হারীত মণ্ডল জেল থেকে ছাড়া পেয়ে রানাঘাটের কুম্পার্স ক্যাম্প, সেখান থেকে পুলিশের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে চরবেতিয়া ক্যাম্প, সেখানেও অব্যবস্থার চূড়ান্ত, সেখানেও হারীত বিদ্রোহ জানিয়ে সকলকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, এবারেও পুলিশের হাতে মার খেয়ে হারীত মণ্ডলকে বাধ্য হয়ে লোকজন নিয়ে চলে যেতে হয়েছিল দণ্ডকারণ্যে স্থানান্তরিত উদ্বাস্তু ক্যাম্প কুরুদ শিবিরে। ঔপন্যাসিক লিখেছেন, "কয়েকদিন আগে দণ্ডকারণ্যের কুরুদ শিবিরে প্রচণ্ড ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে উদ্বাস্তুরা আবার উদ্বাস্তু। এখানকার হাজার সাতেক মানুষের সংসার খোলা আকাশের নিচে। এখনও কোনো রিলিফ এসে পৌঁছোয়নি, দিল্লীতে খবর পৌঁছেছে কিনা সন্দেহ।"[১৩] প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছোলে আনন্দে নেচে উঠেছে ক্যাম্পের মানুষেরা। বিশ্ববাসীর কাছে জনপ্রিয় নেহেরু এই উদ্বাস্তু মানুষগুলির কাছে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। হারীত মণ্ডল ভেবেছে জহরলাল নেহেরু তাঁদের মনে স্বপ্ন বাঁচিয়ে রেখেছিল একদিন তারা দেশে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পাবে। সেই স্বপ্ন তার ক্ষীণ রেখা হারিয়েছে নেহেরুর মৃত্যুতে।

স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে নারীর অবস্থান উঠে এসেছে মমতা, সুপ্রীতি, শান্তি, তুতুল, সুলেখা, চন্দ্রা, অলি প্রভৃতি চরিত্রকে কেন্দ্র করে। মমতা, সুপ্রীতি, শান্তি গৃহকেন্দ্রিক জীবনের বাইরে খুঁজতে চায়নি নিজেদের পরিচয়, স্বামী সন্তানের মধ্যেই হয়েছে তাদের বিশ্বদর্শন, পুরুষ সদস্য ব্যতীত ঘরের বাইরে পা রাখেনি তারা, কিন্তু তাদেরই পরবর্তী প্রজন্মের বা বয়সে সামান্য ছোটো চরিত্রগুলি সন্ধান করেছে নিজেদের স্বরূপ, গড়ে

তুলতে চেয়েছে নিজেদের পরিচয়। তুতুল পড়াশোনা করার চেষ্টা করেছে মন দিয়ে। তার মা সুপ্রীতির ইচ্ছা মেয়েকে শিক্ষিত করে তোলার, কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের লোভী দৃষ্টির সামনে তাকে পড়তে হয়েছে বার বার। কৈশোরে বাইরের জগতের সঙ্গে যুক্ত হতে না পেরে রবীন্দ্র সাহিত্যে ডুবিয়ে দিয়ছিল নিজের সদ্য যৌবন প্রাপ্ত হৃদয়, রাবীন্দ্রিক রোমান্টিকতায় সে প্রেমে পড়েছে নিজের পিসতুতো দাদা পিকলুর, প্রতাপের প্রিয় সন্তান উজ্জ্বল যুবক পিকলুর মৃত্যুতে তুতুল নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে পড়াশোনার জগতে। ডাক্তার হবার স্বপ্ন নিয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবার পর পিকলুর স্মৃতিকে আকড়ে ধরেই সাজিয়ে নিতে চেয়েছে নিজেকে, পিকলুর কথা মনে করে বাঙালী নারী মুক্তির পথিকৃৎ বিদ্যাসাগরের ছবি সাজিয়েছে ঘরে, মনুসংহিতা পড়ে মা সুপ্রীতির বৈধব্য জনিত আচার নিয়মকে নস্যাৎ করতে চেয়েছে। উপন্যাসে কালোবাজারির কারণে আতপ চাল অমিল হলে মাকে বুঝিয়ে সেদ্ধচাল খায়িয়েছে, বাঙালী বিধবার জীবনে কন্যাসন্তানও হয়ে উঠেছে আলোর দিশারী। বিদেশের মাটিতে পা দিয়ে তুতুল নিজের জীবনে পেয়েছে নতুন আলো, পূর্ব বাংলার আলমের সঙ্গ পেয়ে তার জীবন হয়েছে পরিপূর্ণ।

উপন্যাসে মমতার দাদা ত্রিদিবের স্ত্রী সুন্দরী সুলেখার দেহ সৌন্দর্যের কারণে বহু পুরুষ সমাবেশ ঘটেছে তার চারপাশে। উপন্যাসে প্রতাপও বার বার চেয়েছে সুলেখার সান্নিধ্য কিছু সময়ের জন্যে উপভোগ করতে, সুলেখার বেথুন কলেজে ইংরেজির লেকচারার পদে চাকরি পাওয়ার খবরে খুশী হয়েছে প্রতাপ। প্রতাপের ভাবনায় উঠে এসেছে সমকালীন সমাজে নারীর অবস্থান, "এ দেশের মেয়েরা আজকাল লেখাপড়া শিখছে হঠাৎ বিধবা হলে বিপদে না পড়ার জন্যে। স্বাভাবিক, সুখী বিবাহিত জীবন হলে লেখাপড়ার আর কোনও মূল্য নেই।... সুলেখা চাকরি করতে যাচ্ছে প্রয়োজনে নয় শখে, তবু এর মধ্যে একটা রীতি ভাঙার ব্যপার আছে।"[১৪] সুলেখা শিক্ষিতা, তবুও তার দেহ সৌন্দর্যই

হয়েছে পুরুষের আকর্ষণের কারণ। ভদ্রতার আবরণ রাখতে ত্রিদিব তার বন্ধু স্থানীয়দের বলতে পারেনি কিছুই। সুলেখা অবচেতনে চেয়েছে ত্রিদিব তার পৌরুষে রক্ষা করুক সুলেখাকে, কিন্তু ত্রিদিবের ঠাণ্ডা আচরণ তাকে ভেঙে দিয়েছে, ত্রিদিবের বন্ধু রাতুলের ছদ্ম পৌরুষে সে আকৃষ্ট হয়েছে, যদিও সুলেখা বুঝেছে রাতুল ভুল পথ, ত্রিদিবের হাত ধরে দিল্লী গিয়ে সুলেখা রক্ষা করতে চেয়েছে নিজেদের, পালাতে চেয়েছে নিজের থেকে, কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে নগ্ন হয়ে বেরিয়ে আসা পুরুষের লোভ ও নিজের মনে জেগে ওঠা দ্বিধা আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়েছে সুলেখাকে, ত্রিদিব তাকে রক্ষা করতে না পারার গ্লানি নিয়ে দেশত্যাগী হয়ে নিজের জীবনকে নিয়ে গেছে ধ্বংসের পথে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নারী জীবনে উঠে এসেছে আধুনিক জটিলতা।

উপন্যাসে চন্দ্রা-অসমঞ্জ রায় বৃত্তেও নারীর সামাজিক অবস্থানকে বিচার করেছেন ঔপন্যাসিক। চন্দ্রা তার স্বামীর সঙ্গে এলাহাবাদে থাকে না, তার ধনী পিতার প্রশ্রয়ে সে মেতেছে সমাজসেবায়। সাজগোজ করে, সিগারেট খায় চন্দ্রা। পুরুষের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারে, কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাকে বাঁচতে দিতে পারেনি নিজের মতন করে। হারীত মণ্ডলের ছেলে কিশোর সুচরিতকে দ্বায়িত্ব নিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে সমাজের মূলস্রোতের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিল চন্দ্রা। চন্দ্রাকে দেখে কিশোর সুচরিতও অবাক হয়েছে, "সুচরিত এ পর্যন্ত দেখে এসেছে যে পুরুষরা বড়, মেয়েরা ছোটো। পুরুষরা দরকারি কথা বলে, মেয়েরা শোনে। মেয়েরা মাঝে মাঝেই ঝগড়া করে বটে, কিন্তু পুরুষদের মতন হুকুমের সুরে কথা বলতে জানে না। কিন্তু চন্দ্রা এখানে মধ্যমণি, সে কথা বলছে, অন্যরা শুনছে। অসমঞ্জ রায়ের মতন ইংরেজি জানা মানুষকেও সে মাঝে মাঝে আঙুল তুলে বোঝাচ্ছে কোনও কোনও কথা। ইংরেজি বলছে ফরফর করে। একবার সে প্যাকেট থেকে সিগরেট বার করতেই অসমঞ্জ রায়ের মতন রাশভারী মানুষ নিজে দেশলাই জ্বেলে

সেটা ধরিয়ে দিল।”[১৫] এক কিশোরের মনোজগতে এ এক সম্পূর্ণ নতুন ঘটনা। উপন্যাসে অসমঞ্জ বাবুর স্ত্রী প্রীতিলতা অসুস্থ, তিনি পুরোপুরি ঝুঁকে পড়েছেন চন্দ্রার দিকে, যদিও চন্দ্রার পক্ষ থেকে তিনি পাননি কোনো সচেতন প্রশ্রয়। অসমঞ্জ চন্দ্রার প্রতি প্রবল আকর্ষণেই নেমেছেন সমাজ সেবার ভূমিতে। চন্দ্রা আশ্রয় দিয়েছে হারীত মণ্ডলের ছেলে সুচরিতকে। সুচরিতেও মনের গভীর গহনে প্রবেশ করেছে চন্দ্রা। চন্দ্রাকেও বহু পুরুষের লোভী চোখ থেকে বাঁচতে গ্রহণ করতে হয়েছে সন্ন্যাসিনীর জীবন। নিজের ছন্দে বাঁচার সুযোগ পায়নি সে। এমনকি সুচরিতকে মানুষ করার স্বপ্নও তার পূরণ হয়নি।

উপন্যাসে ইতিহাসের বাস্তব সত্যকে ঔপন্যাসিক বানিয়েছেন সাহিত্যের সত্য। ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্রগুলোকে অবিকৃত রেখেই তিনি তুলে ধরেছেন সময়কে। ইতিহাসের পাতার দেবত্বে উন্নীত ব্যক্তিত্বদের দেখিয়েছেন ভালো মন্দে মিশ্রিত মানুষ হিসেবে। ইতিহাস ও কাহিনী চলেছে সমান্তরালভাবে। ১৯৫৪ সালের ১০ই মার্চ পাকিস্তানের নির্বাচনে এ কে ফজলুল হকের বিরাট জয়ের সংবাদে খণ্ডিত ভারতবর্ষেও একটা আশার আলো জেগে উঠেছিল। নির্বাচনে জয়লাভ করে ফজলুল হক অমুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। ঔপন্যাসিক লিখেছেন, “প্রাচীন এই বিশ্বাসযোগ্য মানুষটি আর যাই হোক সাম্প্রদায়িকতায় উসকানি দেবেন না।... দেশভাগের নামে বাঙালি জাতির নামে বিভেদরেখা টানায় তাঁর আপত্তি ছিল। ফজলুল হক ঘোষণা করেছিলেন, ঘোষণা করেছিলেন ভিসা ব্যবস্থা তুলে দেবেন, দুদিকের আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে অবাধ সাক্ষাৎ আর মোলাকাতের আর কোনোও অন্তরায় থাকবে না।”[১৬] এক মাসের মধ্যেই ৩রা এপ্রিল অবিভক্ত পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মহম্মদ জানালেন ফজলুল হক দেশের শত্রু, তিনি স্বায়ত্ত শাসনের কথা উচ্চারণ করেছেন। ফজলুল হক গৃহবন্দি হলেন, শেখ মুজিবর রহমান নিক্ষিপ্ত হলেন কারাগারে। সেনাপতি ইস্কান্দার নির্জার হাতে তুলে দেওয়া হল

সর্বময় কর্তৃত্ব। পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবার শুরু হল উদ্বাস্তু স্রোত। স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, ফুটপাত হয়ে উঠল মানুষের আস্তানা। কলকাতা শহর তথা পশ্চিমবঙ্গ উদ্বাস্তু সমস্যায় হতে থাকল জর্জরিত। ভারত সরকার উদ্বাস্তু পুর্নবাসনের জন্যে স্থির করলেন আন্দামান ও মধ্যপ্রদেশের দণ্ডকারণ্য।

যে সময়ে দাঁড়িয়ে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের ওপর উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, চেষ্টা করছে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের বাঙালী সত্তা হরণ করে তাদের শুধুই মুসলমান বানিয়ে তোলার, সে সময়েই পশ্চিম বাংলার সঙ্গে বিহারকে যুক্ত করে দেওয়ার প্রস্তাব উঠেছিল তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের পক্ষ থেকে। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ছিলেন এর সমর্থক, পশ্চিমবাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় এই প্রস্তাব লুফে নিয়েছিলেন। পশ্চিম বাংলার মানুষ এই প্রস্তাব শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। শুধু বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিই নয়, শুধু বুদ্ধিজীবীরা নয়, শুধু শিক্ষক ছাত্র সমাজ নয় পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষও এই একত্রীকরণের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল।

একদিকে পশ্চিমবঙ্গে প্রবহমান উদ্বাস্তু সমস্যা, অন্যদিকে পূর্ববঙ্গে মৌলবাদী শক্তি ও তার বিরোধিতায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা প্রগতিশীল মানবিকতা। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, শুধু স্বাধীনতা তথা দেশভাগের সময়কালে নয় পরবর্তীকালে প্রায় বহু বছর ধরে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু ধর্মের মানুষেরা ভারতবর্ষে এসেছে প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সর্বস্বান্ত হয়ে। ১৯৪৬-৪৭ সালে নোয়াখালি ত্রিপুরার দাঙ্গায়, ইসলামিক রাষ্ট্রে হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পর্যবসিত হওয়ায়, হায়দ্রাবাদের মতো পূর্ববঙ্গেও ভারত আক্রমণ করতে পারে এই অনুমানে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ফলে তাদের দেশত্যাগ ঘটে। ১৯৫০-৫১ সালে দাঙ্গার ফলে বন্যার জলস্রোতের মতো বাঙালী হিন্দুর নির্গমন ঘটে। ১৯৫২ থেকে ৬০ কালপর্বে বাঙালী হিন্দুর দেশত্যাগ ঘটে পাসপোর্ট প্রবর্তনের ফলে, দাঙ্গার

ফলে, সম্পত্তি বিক্রয় সংক্রান্ত আইনের ফলে। খালেদা জিয়ার নির্বাচনে জয়ের ফলে হিন্দুদের বাংলাদেশ ত্যাগ আরও বেড়ে গিয়েছিল। অশ্রুকুমার সিকদার লিখেছেন, "দীর্ঘদিন ধরে এই হারিয়ে যাওয়া প্রতিফলিত হয়েছে পূর্ববঙ্গ/ পূর্ব পাকিস্তান/ বাংলাদেশের আদমশুমারিতে। ১৯৫১ সালে হিন্দু ছিল ঐ দেশের মোট জনসংখ্যার ২২%, ১৯৬১ সালে ছিল ১৮.৫%, ১৯৭৪ সালে তা নেমে দাঁড়ায় ১৩.৫% । ১৯৮১ সালে আরো নেমে হয় ১২.১%।"[১৭] অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের জনগণনার দিকে তাকালে লক্ষ্য করা যায় পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যা হ্রাসের কোনো প্রমাণ মেলেনি, বরং মুসলমান সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার বৃদ্ধি চোখে পড়েছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংস, গুজরাটের নরহত্যা, পূর্ববর্তী অনেক দাঙ্গা সত্ত্বেও বিপরীত নির্গমন হয়নি। ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে যে বিপুল সংখ্যক মানুষ চলে আসায় যে ভয়াবহ সংকট তৈরী হয়েছিল সে সংকট পূর্ববঙ্গকে ভোগ করতে হয়নি।

উপন্যাসে প্রতাপের বন্ধু মামুনকে কেন্দ্র করে উঠে এসেছে স্বাধীনতা পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলা। কলেজ জীবনে কলকাতায় প্রতাপের সঙ্গে মামুনের ছিল গভীর সখ্যতা। কবিতা রচনার প্রতি মামুনের ছিল প্রবল ঝোঁক। কলেজ জীবনের শেষে মানুষ যুক্ত হয়ে পড়েছিল প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে। হয়ে উঠেছিল আওয়ামি মুসলিম লিগের একজন মাঝারি নেতা। এই প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদানই মামুনের কলেজ জীবনের রোম্যান্টিকতা ভেঙে দিয়েছিল। তিনি দেখলেন, "সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে নাস্তিকতার স্থান নেই।... ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, তার মধ্যে একজন নাস্তিকতা সমর্থকের স্থান থাকতে পারে না। গ্রামে ঘোরার সময়ে তিনি কোরাণ হাদিস পড়তেন মন দিয়ে। বক্তৃতার সময়ে কায়দা মাফিক উদ্ধৃতিও দিতে শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর মনের গভীরে আর ধর্মবিশ্বাস প্রোথিত হয়নি।"[১৮] এখানেই ঔপন্যাসিকের সময় সন্ধান। 'সেই সময়' উপন্যাসের কালপর্বে দাঁড়িয়ে

ইরফান ডারউইনের বিবর্তনবাদ পড়ে নাস্তিকতায় দীক্ষিত হলেও গ্রামে ফিরে আবার ডুবে গিয়েছিল ধর্মবিশ্বাসের জঠরে, কিন্তু সময়ের বিবর্তন পরিবর্তিত করেছে মামুনকে সে ডুবে যেতে পারেনি বিশ্বাসের পথে। স্বাধীনতার আগেই ১৯৪৬ সালে মামুন কলকাতা ছেড়ে চলে এসেছিল। তাই ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ফলাফল হিসেবে কলকাতার পথে পথে রক্তগঙ্গা আর মৃত মানুষের স্তুপ তাকে দেখতে হয়নি। ঔপন্যাসিক লিখেছেন "পঞ্চাশের দাঙ্গার সময়ে তিনি ছিলেন বরিশালের গ্রামাঞ্চলে। দাঙ্গার ভয়ঙ্কর রূপ সেবারে তিনি খানিকটা দেখেছিলেন।... এক স্টিমার ভর্তি হিন্দু নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধদের পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইন্ডিয়ায়। ...তারা প্রায় প্রত্যেকেই মা কিংবা বাবা, ভাই কিংবা বোনকে কিংবা সবাইকেই হারিয়েছে দাঙ্গায়, তারা চিরকালের মতন ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে তাদের ভিটেমাটি, তাদের পিতৃপুরুষের দেশ। কার দোষে? তাদের নিজেদের কোনও দোষ ছিল?... অন্যদিকে কলকাতার দাঙ্গায় অনেক মুসলমান পরিবার ধ্বংস হয়েছে, সর্বস্বান্ত হয়েছে।... যার যার দুঃখটা সে সবচেয়ে বেশী বোঝে এই সহসা বিপদের জন্যে তারা তো হিন্দুদেরই দায়ী করবেই। কেউ তাদের আসল কারণটা বোঝতে সাহস করে না।"[১৯] দেশভাগের পূর্বে ফজলুল হক মামুনকে বলেছিলেন মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথা। দেশভাগ পরবর্তী সময়ে দেশে অনেক স্কুল খোলা হয়েছে। হিন্দুরা চলে যাবার পর মুসলমান ছাত্রই বেশী। সাধারণ মুসলমান পরিবারেও শিক্ষার চল হয়েছে। শিক্ষার অনিবার্য পরিণতিতে গ্রামে গ্রামেও তৈরি হয়েছে বেকারের দল। মামুন বুঝেছে, "সাহেবরা চলে গেছে। হিন্দুরাও অনেকে চলে গেছে, কিন্তু সেই চাকরি পেল কারা? সবই তো নিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানীরা।"[২০] পাকিস্তানের জন্যে বাঙালী মুসলমানদের দাবীই ছিল সবচেয়ে জোরালো, কিন্তু পাকিস্তানের স্বপ্ন বাস্তব হতেই সব ক্ষমতা চলে গেল পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে। মহম্মদ আলি জিন্না পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম মুহূর্তে দেশ থেকে এই দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জিন্নার মৃত্যুর পর উগ্র

সাম্প্রদায়িকতা ও ভারতবিদ্বেষ। দেশনেতারা প্রচার করতে শুরু করলেন বাংলা হিন্দুদের ভাষা, সেই ভাষা বর্জন করে গ্রহণ করতে হবে উর্দু। ঢাকায় প্রকাশ্য রাজপথে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র ও জনসাধারণের ওপর গুলি চলল, সেদিন প্রমাণিত হল শোষকের কোনো জাতি বা ধর্ম হয় না। পৃথিবীর সব দেশে রয়েছে দুটি শ্রেণী – শোষক আর শোষিত। উপন্যাসে যখন বলা হয়েছে, "তিন বছর আগের ভাষা আন্দোলন ও বিক্ষোভের সঙ্গে মামুন যে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন, ঢাকায় সেই ভয়ঙ্কর উত্তাল একুশে ফেব্রুয়ারির গুলি চালনার সময় তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী।"[২১] তখন স্পষ্টই ধরে নেওয়া যায় উপন্যাসের ঘটনাক্রম ১৯৫৫ থেকে শুরু।

দ্বিধাবিভক্ত বাংলার বেকারত্ব, রাজনৈতিক ডামাডোল, ছিন্নমূল মানুষগুলির যন্ত্রণাদীর্ণ জীবন, কালোবাজারি, দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ উপন্যাসের পাতায় পাতায় সময়কে জীবন্ত করেছে। একদিকে পশ্চিমবঙ্গে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভের দশ বছর পরেও দারিদ্র লাঞ্ছিত জীবন, অন্যদিকে পূর্ববঙ্গে সদ্য সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠছিল জনমানসে, তৎকালীন নেতা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে জনমত গরিষ্ঠ হয়েছিল পূর্বপাকিস্তানে। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবরের পর পূর্বপাকিস্তানে এসেছিল একটা অন্ধকার সময়। জেনারেল আইয়ুবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানে গণতন্ত্র বাতিল করে দিয়ে সামরিক আইন জারি করেছিল, তার কুড়ি দিন পরে ইস্কান্দার মীর্জাও বিতাড়িত হল দেশ থেকে, আইয়ুব খান হয়ে উঠলেন সর্বেসর্বা। সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হল, নেতারা হলেন কারারুদ্ধ। পূর্ব পাকিস্তানের মনে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি জন্মাতে শুরু করল প্রবল বিরোধিতা। মওলনা ভাসানীর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করল পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী জনগন। উপন্যাসে মওলানা ভাসানী তাঁর সভায় যখন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন তখন

মামুন শিউরে উঠেছেন এসব কথা শুনে, "এ তো বিচ্ছিন্নতাবাদের জিগির! এত কষ্টের, এত সাধের, এত রক্ত বর্ষণ করে পাওয়া যে পাকিস্তান মওলানা তা ভেঙে দিতে চান? মাত্র দশ বছর হয়েছে এই নতুন রাষ্ট্রের, অনেক ভুলভ্রান্তি হতে পারে, কিন্তু তাকে ভেঙে ফেলার কোনো প্রশ্নই আসে না।"[২২]

এখান থেকে চিনে নেওয়া যায় সময়কে। স্বাধীনতার কয়েক বছর পেরিয়ে এদেশে জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে এসেছে। দেশবাসীর কাছে দেশ হয়ে উঠেছে শুধুমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের পটভূমি। স্বাধীনতার পরে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই ও নতুন চাকরির অভাব এবং ভোগ্যপণ্যের অভাবে ছাত্র ও যুবসমাজ জাতীয়তাবাদ ছেড়ে মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকেছে, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র ও যুব শাখা শক্তিশালী হতে শুরু করেছে। বিরোধী পক্ষের মিছিল সমাবেশের ওপর স্বাধীন দেশেও লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাস চলেছে ব্রিটিশ কায়দায়। গান্ধিজীকে 'জাতির জনক' উপাধি দিয়ে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রস্তরমূর্তি, তাঁর আদর্শ স্বাধীন ভারতের সরকার মনে রাখেনি। এই সময়ে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলছে স্বাধীনতার দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য আয়োজন। দশ বছরের স্বাধীনতা স্বপ্নের দিন আনতে না পারলেও গণতন্ত্র বজায় থাকার গৌরবে মাতোয়ারা হয়েছে গোটা ভারতবর্ষ। যদিও লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের চরম বিপর্যস্ত জীবন, বহু ব্যাঙ্কের পতন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, মনুষ্যত্বের চরম বিপর্যয় মাথা চাড়া দিয়েছে তবুও উপন্যাসে প্রতাপও বেরিয়ে পড়েছেন ছোটো মেয়ে মুন্নির হাত ধরে এই স্বাধীনতার জোয়ারে গা ভাসাতে। প্রতাপ ভেবেছেন, "স্বাধীনতার পর অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয় তা সবাই জানে। ... কিন্তু ত্যাগ স্বীকার করছে কারা? শুধু গরিবরা। যারা ধনী তারা আরও ধনী হচ্ছে। ... এই দশ বছর ধরে পণ্ডিত নেহেরু ভারতে টিকিয়ে রেখেছেন গণতন্ত্র। এই তাঁর গর্ব। শুধুই ভোটের গণতন্ত্র।"[২৩]

সেই সময়ে পূর্ববঙ্গে ১৯৫৮ -র সেই কালরাত্রির পর, সব রাজনৈতিক দলগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছিল, পার্টি অফিসগুলি তালাবন্ধ

করে, নেতাদের সব জেলে পুরে, রাজনৈতিক দলগুলো যাতে আর কোনোদিন মাথা তুলতে না পারে তার ব্যবস্থা করেছিল সরকার। সামরিক শাসনের অত্যাচারে কেউ আন্দোলন করতে সাহস পায়নি। দোকানদারদের ওপর জোর জুলুম করে কমানো হল জিনিসপত্রের দাম, বন্ধ করে দেওয়া হল বিশ্ববিদ্যালয়। রাস্তায় রাস্তায় মিছিল নেই, পুলিশ জনতার খণ্ডযুদ্ধ নেই, সাধারণ জনতার অনেকেই ভাবল, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো, রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক অশান্তি, যখন তখন মন্ত্রিসভার পতন, আইন শৃঙ্খলার অবনতি, এসবের হাত থেকে তো মুক্তি পাওয়া গেছে তাহলে মিলিটারিরাই তো ঠিকমত দেশ চালাতে পারে বলে মনে হতে লাগল, তিক্ত বুদ্ধিজীবীরা ভাবতে শুরু করেছিলেন এই দেশ গণতন্ত্র পাবার যোগ্যই নয়। কয়েক বছরের মধ্যে মনোভাব বদলে গেল রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খাঁ -এর। তিনি নিজের পছন্দ মতন সংবিধান প্রণয়ন করেছেন, সেখানে তাঁর সুবিধে মত নির্বাচনের ব্যবস্থাও আছে, বেসিক ডেমোক্রেসির নামে একটা দলহীন নির্বাচন করলেন সেটা হাস্যকর দাঁড়াল। আইয়ুব চাইলেন একটা সরকারী দল গড়ে তুলতে। সহকর্মীদের পরামর্শে তিনি পুরোনো মুসলিম লিগের একটা অংশ নিয়ে গড়ে তুললেন পাকিস্তান মুসলিম লিগ। পূর্ব পাকিস্তানে এতদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই বার বার উত্তাল হয়ে সরকার কাঁপিয়েছে, গভর্ণর মোনেম খাঁ প্রচুর টাকা খরচ করে দালাল লাগিয়ে ছাত্রদের মধ্যেও একটা নতুন সরকারী পার্টি গড়ে তুললেন, নাম ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফ্রেডারেশন, এই পার্টির ছেলেরা ফেল করলেও পাশ করে যাবে, এরা কোনো সহকর্মীর পেটে ছুরি বসালেও এদের কোনোও শাস্তি হবে না, অধ্যাপকেরা এদের কথা শুনতে বাধ্য থাকবেন, ইউনিভার্সিটি কবে খোলা থাকবে কবে বন্ধ থাকবে তাও এরাই ঠিক করবে, উত্তম সরকার ভক্তি দেখাতে পারলে ছাত্ররা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জলপানি পাবে। জেল থেকে বেরিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হোসেন সোহরাওয়ার্দি এক নতুন চাল চাললেন আইয়ুবের ওপর, তিনি বললেন কোনো রাজনৈতিক দলেরই আলাদা অস্তিত্ব রাখার দরকার নেই।

কোনোও একটি দল এককভাবে আইয়ুব খানের সঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিততে পারবে না বলেই সোহরাওয়ার্দি সব দলের পৃথক অস্তিত্ব বিলোপ করে যুক্তরাষ্ট্র গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, একটি মাত্র দলের সর্বাধিনায়ক হওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু বৃদ্ধ সোহরাওয়ার্দির স্বপ্ন পূরণের আগেই মৃত্যু তাঁকে উত্তীর্ণ করল অন্য জগতে। যুক্তফ্রন্ট ধ্বংস হল, শেখ মুজিবর রহমান আওয়ামি লিগের একছত্র নেতা হয়ে দলটিকে আবার সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করলেন। মৌলনা ভাসানীও তাঁর ন্যাপ দলকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন।

উপন্যাসে পাশাপাশি এগিয়ে নিয়ে গেছেন দুই বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক মানচিত্র। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে সরকারের উদাসীনতায় ছিন্নবিছিন্ন হয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন, ১৯৬২ সালে যখন এদেশের কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে চীনকে আদর্শ দেশ বলে ভেবে নেওয়ার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, সেই সময়েই ম্যকমিলান লাইনকে কেন্দ্র করে চীন আক্রমণ করল ভারতকে, সময়টা ১৯৬২। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর কাছেও এটা একটা বিশাল ধাক্কা। উপন্যাসে এসেছে ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর মৃত্যু। সময়টা ২৭ মে, ১৯৬৪। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস নতুন পথে এগোল। ১৯৬৫ সালে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত পাকিস্তান সীমান্ত সংঘর্ষ নাড়িয়ে দিল দুই দেশের আপামর জনগণকে। এই যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্ল্যাকআউটের সময়কে ফিরিয়ে এনেছিল। এই সময় থেকে পাকিস্তানের একতা ধ্বংসের দিকে যেতে শুরু করল, পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ, বিমাতৃসুলভ মনোভাব পূর্ব পাকিস্তানকে ভেঙে দেওয়ার পথকে প্রশস্ত করেছিল। দুই বাংলার যুব মানসে কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল। ১৯৪০ সালে যেখানে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, সেই লাহোরেই ছাব্বিশ বছর পর ১৯৬৬ তে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ছয় দফা প্রস্তাবের মধ্য দিয়েই পৃথক বাংলাদেশের

দাবীর পথ প্রশস্ত হল। পূর্বপাকিস্তানে শুরু হল প্রচণ্ড ধরপাকড়, প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা সম্পন্ন মানুষেরা গ্রেপ্তার হলেন, উপন্যাসে মামুন গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাঁকে বিনা নোটিশে হারাতে হয়েছে সাংবাদিকতার পদ।

'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গই শুধু নয় পৃথিবীর দুই প্রান্তে পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলিও উঠে এসেছে, উঠে এসেছে মাটির পৃথিবী ছাড়িয়ে আকাশ ও মহাকাশ। ঔপন্যাসিক লিখেছেন, "পূর্ব থাকলে পশ্চিম থাকবেই। সব দেশের মধ্যেই পূর্ব-পশ্চিম আছে। আমাদের পৃথিবীটাও পূর্ব-পশ্চিমে বিভক্ত, উত্তর দক্ষিণে নয়, এমনকি ভালো করে ভেবে দ্যাখো, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেও একটা করে পূর্ব-পশ্চিম আছে। পূবের চেয়ে পশ্চিম অনেক বেশী বর্ণাঢ্য, কারণ ধ্বংসের আগে কিংবা অস্তাচলে যাবার আগে আভাটা বেশি হয়। ...পূবের আকাশ ও পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য কোরো।"[২৪] উপন্যাসে তিনি তুলে এনেছেন মহাকাশ গবেষণা, আমেরিকার মহাকাশযান জেমিনি ৭ নম্বরে চেপে মহাকাশে পাড়ি দেওয়া বিজ্ঞানীদেরও বানিয়ে তুলেছেন উপন্যাসের চরিত্র।

উপন্যাসে অতীনকে কেন্দ্র করে উঠে এসেছে কলকাতার কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়া শিক্ষিত যুব সমাজ, দেশের এহেন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে তারা দীক্ষিত হয়েছে কমিউনিস্ট মতাদর্শে। মানিকদার স্টাডি সার্কেলে অতীন, কৌশিক, পমপমের মতন ঝকঝকে যুবক যুবতী পরিচিত হয়েছে কমিউনিস্ট মতাদর্শের সঙ্গে, বুঝেছে গোটা পৃথিবীতে আছে দুটি শ্রেণী – শোষক আর শোষিত। একই সময়ে দাঁড়িয়ে দুই বাংলার শিক্ষিত যুব সমাজ বুঝেছে শোষক আর শোষিতের কোনো জাত বা ধর্ম হয় না। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায়, গোটা দেশে যখন পশ্চিম বাংলার পরিচয় শুধুমাত্র কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে, ঠিক সেই সময়ে উত্তরবাংলার একটি অজ্ঞাত পরিচয় থানা নক্সাল বাড়ির নাম চমকে দিয়েছিল গোটা দেশকে। নক্সালবাড়ির একটি গ্রামে একদিন একদল আদিবাসী কৃষক তীর- ধনুক- বর্শা- লাঠি- সোঁটা নিয়ে দৌড়ে এসে

বসে পড়লে একখণ্ড জমির ওপর, সেই জমির চারপাশে লাল পতাকা পুঁতে দিয়ে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। এমন কিছু অভিনব ব্যাপার নয়, জমি দখলের চেষ্টা ও জোর করে ফসল কেটে নেওয়া প্রতি বছরই ঘটে, আবার পুলিশের সাহায্য নিয়ে জোতদাররা জমি থেকে জবর দখলকারীদের প্রতিবার উচ্ছেদও করে দেয়। উত্তরবঙ্গের কিষাণ সভা সাতষট্টি সালে এরকম জমি দখলের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এরমধ্যে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়ে শাসনভার পেয়েছিল যুক্ত ফ্রন্ট এবং শাসনভার পেয়েছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসু, সুতরাং পুলিশ বাহিনী গেল না কৃষকদের বিরুদ্ধে। প্রথমবারের সাফল্যে উদ্দীপ্ত হয়ে কিষাণ সভার নেতৃত্বে পরবর্তী দশ সপ্তাহের মধ্যে আরও ষাটটি জমি দখলের ঘটনা ঘটে গেল, বাধা এল সামান্য। কিষাণ সভার কিছু নেতার ধারণা হল চাষি ও মজুরদের নিত্য ব্যবহার্য অস্ত্র দিয়েই শুরু হবে বিপ্লব। কয়েক মাস পরে নক্সালবাড়ির অন্য একটি অঞ্চলে জয়ের স্বাদ পাওয়া উগ্র কৃষকদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন কয়েকজন পুলিশ, একজন পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হল। সেইদিনই আরও একদল পুলিশ ঘেরাও হল, সামান্য প্ররোচনাতেই পুলিশ গুলি চালিয়ে হত্যা করল সাতজন নারী, দুজন শিশু সহ দশজনকে। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সবসময়েই কৃষক ও মজুরদের স্বার্থ দেখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেই দলেরই নেতা পুলিশ মন্ত্রী সুতরাং এই ঘটনায় সারা দেশ স্তম্ভিত। উত্তরবঙ্গের কমিউনিস্ট যেসব নেতারা বিপ্লবের নামে এসব সংঘর্ষে উসকানি দিচ্ছিল তাদের নিরস্ত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে বিতাড়িত করা হয়েছিল দল থেকে, গ্রেফতার হয়েছিল অনেকে, কিছুদিনের জন্যে বিদ্রোহ স্তব্ধ হলেও মধ্যে দাবানলের মত ভয়াবহ রূপ নিতে সময় লাগেনি এই নক্সালপন্থী বিপ্লব প্রচেষ্টার। এই বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল হাজার হাজার মেধাবী তরুণী তরুণ, কিন্তু এই বিপ্লবের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ যুবসমাজকে নেতৃত্বের জন্যে তাকিয়ে থাকতে হয়েছিল চিন দেশের দিকে। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতাদের কাছ থেকে দেশে দেশে বিপ্লবের আহ্বান শোনা যায়নি।

ভিয়েতনাম যুদ্ধেও তাঁরা গা বাঁচিয়েছিল। চিনের সঙ্গে রাশিয়ার বিচ্ছেদের প্রশ্নেই মূলত ভাগ হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। গরিষ্ঠ সংখ্যক দলটির নাম হয়েছিল সি. পি. (এম); এরা ছিল চীনপন্থী, কিন্তু এরাই যখন সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে পশ্চিম বাংলায় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গঠন করল, তখন বহু তরুণ সদস্যদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল বিক্ষোভ। তাদের মনে তখন জ্বলজ্বল করছিল লেলিনের উক্তি, পার্লামেন্ট আসলে শুয়োরের খোঁয়াড়। জহরলাল নেহেরু তাঁর 'The discovery of India' (1946) গ্রন্থে লিখেছেন, "Recent events all over the world have demonstrated that the notion that nationalism is fading away before the impact of the internationalism and proletarian movement has little truth. It is still one of the most powerful urges that move a people and round it cluster sentiments and traditions and a sense of common living and common purpose. While the intellectual strata of the middle classes were gradually moving away from nationalism, or so they thought, labor and proletarian movements, deliberately based on internationalism, were drifting towards nationalism.[২৫]

আত্মজীবনী 'অর্ধেক জীবন' -এ সুনীল লিখেছেন, "কলকাতার দেওয়ালে যখন প্রথম দেখি বিপ্লবের অগ্নি অক্ষরে নানা রকম আহ্বানের সঙ্গে ঘোষণা 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' তখনই আমাদের অনেকের খটকা লেগেছিল। নক্সালবাড়ির বিপ্লব প্রচেষ্টার সঙ্গে চীনের সম্পর্কের তাৎপর্য আমি তখনও ঠিক বুঝতে পারিনি। কিংবা সেই সম্পর্কের প্রকৃত ইতিহাস এখনও উদঘাটিত হয়নি। লেলিন - স্তালিনের পর মার্ক্সবাদী দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক মাও সে তুঙ সত্যিই কি এমন অপরিকল্পিত এমন প্রস্তুতিহীন ভাবে তাড়াহুড়ো করে ভারতের মতো একটি বহুজাতি, বহুভাষা, বহুধর্মের দেশে শুরু করার প্ররোচনা দিয়েছিলেন? অথবা তাঁর অজ্ঞাতসারে চীন সরকারের এ ব্যাপারে অন্য

কোনো উদ্দেশ্য ছিল। পিকিং বেতার থেকে একটি মেয়ে অতীব ধারলো কন্ঠস্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে ইংরাজীতে যে সব খবর প্রকাশ করত, তা আমরাও দুপ্রকার শুনেছি। সব ডাহা মিথ্যে কথা।... বাংলার তরুণরা চীনের যে নেতাকে বিপ্লব তরণীর কর্ণধার বলে গণ্য করতে শুরু করেছিলেন, তার নাম ছিল লিন পি আও। পরবর্তীকালে সে লিন পি আও ক্ষমতালোভী ও বিশ্বাসঘাতক হিসেবে প্রমাণিত হন। একটা বিমান নিয়ে তিনি চিন থেকে পালাতে গিয়ে নিহত হন রহস্যজনকভাবে।"[২৬] যদিও শুধু তরুণরাই নয় মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট দলের কিছু কিছু প্রবীণ নেতাও আশু বিপ্লবের জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। বিপ্লবী দলের প্রধান নেতা হয়েছিলেন চারু মজুমদার। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের একমাত্র পথ সশস্ত্র বিপ্লব এবং তার জন্যে গড়িমসি করার প্রশ্ন ওঠে না। যে দেশে সুসংগঠিত সেনাবাহিনী আছে সে দেশে বিপ্লব শুরু করতে গেলে জনসাধারণের হাতে অস্ত্র দিতে হবে, কিন্তু চারু মজুমদারের মতে অস্ত্রের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকাটাও এক প্রকারের শোধনবাদ। দা, কুড়ুল, কাস্তে, লাঠি এগুলোও অস্ত্র, গ্রামের মানুষ এসব অস্ত্র ব্যবহার করতে জানে। এ দিয়ে লড়াই শুরু করে গড়ে তুলতে হবে ছোটো এলাকা ভিত্তিক মুক্তিসংগ্রাম। সুযোগ পেলেই কেড়ে নিতে হবে অত্যাচারীদের অস্ত্র।

উপন্যাসে অতীন ও তার বন্ধুরা পরিচিত হয়েছে শিলিগুড়িতে বসে নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখা চারু মজুমদারের সঙ্গে। উপন্যাসের চরিত্র চারু মজুমদারকে বলতে শোনা গেছে "অস্ত্রের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসে থাকাও আসলে শোধনবাদ। কেন, দা, কুড়ুল, শাবল, কাস্তে, লাঠি এগুলোও কি অস্ত্র নয়? গ্রামের মানুষ এই সব অস্ত্রই ব্যবহার করতে জানে। এইসব দিয়েই লড়াই শুরু করা যায়। গ্রামের মানুষকে বোঝাতে হবে যে, জোতদার-পুলিশ-বুর্জোয়া পার্টির অত্যাচারে মুখ বুজে থাকলে চলবে না। প্রতিঘাত করতে হবে। ছোটো ছোটো এলাকা ভিত্তিক মুক্তি সংগ্রাম গড়ে

তুলতে হবে। ... তারপর ওদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিতে হবে। মাও সে তুঙ বলেননি, 'শত্রুর অস্ত্রাগার আমাদেরই অস্ত্রাগার'।"[২৭] উপন্যাসে অতীন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যুক্ত হয়ে পড়েছে, মানিকদাকে বাঁচাতে গিয়ে তার হাতে মৃত্যু হয়েছে একজন দুষ্কৃতির। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের শেষ এখানেই।

উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড ঔপন্যাসিক উৎসর্গ করেছেন, 'বেগম জাহানারা ইমাম ও তাঁর মত জননীদের উদ্দেশ্যে। ' দ্বিতীয় খণ্ডের সূচনায়, এসেছেন মুজিবর রহমান, 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' এবং 'স্বাধীন বাংলা শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ' পালন করেছে প্রতিরোধ দিবস, দেশের জনসাধারণ উত্তাল, শেখ মুজিবের দোতালা বাড়ির ছাদে, শস্যশ্যামলা বাংলার প্রতীক লাল বৃত্তের মধ্যে সোনালি রঙে পূর্ব বাংলার মানচিত্র আঁকা নতুন পতাকা, শ্রমিকনেতা আবদুল মান্নান একই রকম পতাকা তুলেছে বাড়ির সামনে, শেখ মুজিবর রহমানের বাড়িই ওই সময়ে ছাত্র শ্রমিক বুদ্ধিজীবিদের এক বৃহৎ অংশের আশা আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র। মুজিবর রহমান ভুগছেন দারুণ অস্বস্তিতে। তিনি ভেবেছেন, "স্বাধীন বাংলা স্বাধীন বাংলা রব উঠেছে চতুর্দিকে, সামরিক শাসকদের হাত থেকে দেশের অর্ধেক অংশ ছিনিয়ে নেওয়া কি মুখের কথা? তিনি প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন, কিন্তু বাংলার মাটির দুর্গ পশ্চিম পাকিস্তানিদের কামানের মুখে কতক্ষণ টিকবে? শুধু মনের জোর দিয়ে কি রাইফেল বোমার বিরুদ্ধে লড়া যায়? তিনি পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা আটানব্বই ভাগ ভোট পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু যদি, সত্যিই লড়াই লাগে... তা হলে কি এ দেশের সব মানুষ তার পাশে এসে দাঁড়াবে? যদি লড়াই লাগে... সে লড়াই কতদিন ধরে চলবে ঠিক নেই, কত লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিনষ্ট হবে, সে দায়িত্ব তিনি একা নেবেন?... সকাল থেকে পঞ্চাশটি মিছিল এসেছে শেখসাহেবের কাছে, তার মধ্যে শুধু মহিলাদেরই মিছিল ছটা। সকলেরই এককথা কিছুতেই সামরিক শাসক গোষ্ঠীর কাছে নতি স্বীকার

করা হবে না। শেখ মুজিব অভিভূত হয়ে পড়েছেন। দৃঢ় ভাষায় তাদের ভরসা দিতে গিয়েও তাঁর কন্ঠস্বর কেঁপে যাচ্ছে। যদি সত্যিই রাষ্ট্র বিপ্লব বেঁধে যায় কোন কোন দেশ সাহায্য করবে, কারা অস্ত্র দেবে? যদি কেউ না দেয়? যদি ইন্ডিয়া দোনামনা করে? তা হলে কামানের মুখে ছাতু হয়ে যাবে এইসব সরল, তেজি, আদর্শবাদী ছেলেমেয়েগুলো!"[২৮]

ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যাবে, ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ সোমবার বেলা ১টায় রেডিওতে ইয়াহিয়া খানের কন্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল, প্রচারিত হয়েছিল তাঁর ঘৃণ্য বিবৃতি যেখানে তিনি বলেছিলেন, পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের নেতাদের দুঃখজনক মতবিরোধের কারণে পরবর্তী তারিখ ঘোষণা না করা পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন স্থগিত রাখা হলো। এই দাবীটি ছিল ভুট্টোর, ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করে অত্যন্ত অনুগতভাবে ভুট্টোর সে দাবী মেনে নিয়েছিলেন, কেননা এই অচলাবস্থা ছিল ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার মিলিত চক্রান্তের ফল। ইয়াহিয়ার এই বিবৃতি পূর্ব পাকিস্তানের ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছিল। শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেছিলেন "এটা নীরবে সহ্য করা যায় না, ষড়যন্ত্রকারীদের সুবুদ্ধি ফিরে না এলে ইতিহাস তার নিজের পথে চলবে।"[২৯] শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লিগ ৬ই মার্চ পর্যন্ত প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করেছিল, এবং ৭ই মার্চ গণসমাবেশে শেখ মুজিবর রহমান ভাষণ দেবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। ঢাকার সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল নতুন অঙ্গীকার। ৬ দফা নয়, ১ দফা চাই অর্থাৎ স্বাধীনতা। ৩রা মার্চ ১৯৭১ সকালের দিকে একটি মিছিল জাতীয়তাবাদী শ্লোগান দিতে দিতে চট্টগ্রাম শহরের দিকে এগিয়ে চলেছিল, মিছিলটি অয়্যারলেস কলোনির কাছে পৌঁছতেই অজ্ঞাত পরিচয় কিছু ব্যক্তি মিছিলকারীদের ওপর রাইফেলের গুলী বর্ষণ করল। বেশ কয়েকটি তাজা প্রাণ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল, পার্শ্ববর্তী বাঙালী বস্তিগুলিতেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এইরকম বহু বিচ্ছিন্ন ঘটনা পূর্ব বঙ্গীয়

মানুষদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্যে মরিয়া করে তুলেছিল। পূর্ব পাকিস্তানে জমে থাকা ক্রোধের আঁচ ইয়াহিয়া হয়ত পেয়েছিলেন, তবে তাদের ক্ষোভ যে কত ভয়াবহ আকার নিতে পারে তা তিনি বোঝেননি। বাঙালীদের শান্ত করার প্রচেষ্টায় ১০ই মার্চ ঢাকায় সকল রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে একটি বৈঠক ডাকলেন, কিন্তু শেখ মুজিবর রহমান সহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারা এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন, ততদিনে পূর্বপাকিস্তান 'বাংলাদেশ' নামেই পরিচিত হয়ে উঠেছিল।

শেখ মুজিব বলেছিলেন, "যে মুহূর্তে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আমার লোককে হত্যা করা হচ্ছে, রাজপথে শহীদের রক্ত শুকায়নি সেই অবস্থায় আলোচনার আমন্ত্রণ রূঢ় পরিহাস ছাড়া কিছুই না। যখন সামরিক সমাবেশ অব্যাহত রয়েছে, অস্ত্রের ভাষায় কথা বলা হচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে কোনো আলোচনা বৈঠকের আহ্বান প্রকৃতপক্ষে তোপের মুখে আহত বৈঠকেরই নামান্তর।"[৩০] একই দিনে শেখ মুজিবর রহমান জনগণের প্রতি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে গণবিরোধী সরকারকে সহযোগিতা না করার এবং রাজস্ব কিংবা খাজনা না দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি দাবী জানিয়েছিলেন, সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং ৭ই মার্চের আগে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। অন্যদিকে এসবে কর্ণপাত না করে পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার রাতের অন্ধকারে সৈন্য নিয়ে আসছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। নানা স্থানে বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালাতে শুরু করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার। পশ্চিম পাকিস্তানের অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বাঙালীদের গণ বিক্ষোভ অব্যাহত ছিল। বাঙালীদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা তীব্র করতে ৬ ই মার্চ ১৯৭১ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের পদ থেকে ভাই এড মরাল আহসানকে সরিয়ে লে জেনারেল টিক্কা খানকে নিযুক্ত করা হল। টিক্কা খান লেঃ জেনারেল

সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের থেকে সামরিক আইন শাসকের ক্ষমতাও কেড়ে নিয়েছিলেন। জেনারেল টিক্কা খান ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে 'বালুচ হত্যাকারী' হিসেবে কুখ্যাত। পশ্চিম পাকিস্তান বালুচিস্থান প্রদেশে তিনি নির্মম ভাবে এক অভ্যুত্থান পর্যদস্ত করেছিলেন। বিক্ষোভ থামাতে গিয়ে টিক্কা খান অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় শত শত নিরস্ত্র বালুকে হত্যা করেছিলেন। নারী পুরুষ শিশু নিধনের কারণে তাকে 'বুচার অব বালুচিস্তান উপাধি অর্জন করেছিলেন। এরূপ একজন কুখ্যাত লোককে গভর্ণর এবং সামরিক আইন প্রশাশকের সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োগ করায় বোঝা গেল সামনে দুঃসময়।

৭ই মার্চ ঢাকায় সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপ্ত প্রায় দশ লাখ লোকের জনসমুদ্রে শেখ মুজিবর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা জানেন এবং বোঝেন, আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করছি, কিন্তু ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও যশোরের রাজপথ আমার ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, তারা বাঁচতে চায়। তারা অধিকার পেতে চায়, নির্বাচনে আপনারা ভোট দিয়ে জয়ী করেছিলেন আওয়ামী লিগকে শাসনতন্ত্র রচনার জন্য। আশা ছিল জাতীয় পরিষদ বসবে, আমরা শাসনতন্ত্র তৈরী করবো, এবং এই শাসনতন্ত্রে মানুষ তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক,সাংস্কৃতিক মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু ২৩ বছরের ইতিহাস বাংলার মানুষের আর্তনাদের ইতিহাস। রক্তদানের করুণ ইতিহাস, নির্যাতিত মানুষের কান্নার ইতিহাস। ১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারি করে আইয়ুব খান দশ বছর আমাদের গোলাম করে রাখলেন। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা দেওয়া হল এবং এই অপরাধে আমার বহু ভাইকে হত্যা করা হল। ১৯৫৯ সালে গণ আন্দোলনের মুখে আইয়ুবের

পতনের পর ইয়াহিয়া খান এলেন। তিনি বললেন, জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবেন, শাসনতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা হলো – আমরা তাঁকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে ডাকার অনুরোধ করলাম, কিন্তু মেজরিটি পার্টির নেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার কথা শুনলেন না। শুনলেন সংখ্যালঘু দলের ভুট্টো সাহেবের কথা। আলোচনায় আমি তাদের জানিয়ে দিয়েছি যে, ৬ দফা পরিবর্তনের কোনো অধিকার আমার নেই, এটা জনগণের সম্পদ। কিন্তু ভুট্টো হুমকি দিলেন। তিনি বললেন, এখানে এসে ডবল জিম্মী হতে পারবেন না। পরিষদ কসাই খানাতে পরিণত হবে। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের প্রতি হুমকি দিলেন যে, পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিলে রক্তপাত করা হবে। তাদের মাথা ভেঙে দেওয়া হবে। হত্যা করা হবে। ইয়াহিয়া খান পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন। দোষ দেওয়া হল বাংলার মানুষকে, আমাকে, বলা হল আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্যই কিছুই করা যায়নি। এরপর বাংলার মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল। আমি শান্তিপূর্ণ ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য হরতাল ডাকলাম। জনগণ আপন ইচ্ছায় পথে নেমে এলো। কিন্তু কি পেলাম আমরা? বাংলার নিরস্ত্র জনগণের ওপর অস্ত্র ব্যাবহার করা হলো। আমাদের হাতে অস্ত্র নাই, কিন্তু আমার পয়সা দিয়ে যে অস্ত্র তা ব্যাবহার করা হচ্ছে আমার নিরীহ মানুষদের হত্যা করার জন্য। আমার দুঃখী জনতার ওপর চলছে গুলি। আমরা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, যখনই দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে চেয়েছি, তখনই ষড়যন্ত্র চলেছে – আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ইয়াহিয়া খান বলেছেন, আমি নাকি দশই মার্চ তারিখে গোলটেবিলে যোগদান করতে চেয়েছি। তাঁর সাথে টেলিফোনে আমার আলাপ হয়েছে। আমি তাঁকে বলেছি আপনি দেশের প্রেসিডেন্ট। ঢাকায় আসুন, দেখুন আমার গরীব জনসাধারণকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছে, আমার মায়ের কোল কীভাবে খালি করা হয়েছে। আমি আগেই বলেছি কোনো গোলটেবিল বৈঠক হবে না, কীসের গোলটেবিল বৈঠক?

কার গোলটেবিল বৈঠক? যারা আমার মা বোনের কোল শূন্য করেছে, তাদের সাথে আমি বসব গোলটেবিল বৈঠকে? ৩রা তারিখে পল্টনে আমি অসহযোগের আহ্বান জানালাম। বললাম অফিস আদালত খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করুন। আপনারা মেনে নিলেন। ইয়াহিয়া সাহেব অধিবেশন ডেকেছেন কিন্তু আমার দাবী সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, হত্যার তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখবো পরিষদে বসবো কি বসবো না। এ দাবী মানার আগে পরিষদে বসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। জনগণ আমাকে সে অধিকার দেয়নি। রক্তের দাগ এখনো শুকায়নি। শহীদের রক্ত মাড়িয়ে ২৫ তারিখ পরিষদে যোগ দিতে যাবো না। ... আমি মানুষের অধিকার চাই। প্রধান মন্ত্রিত্বের লোভ দেখিয়ে আমাকে নিতে পারেনি। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে নিতে পারেননি। আপনারা রক্ত দিয়ে আমাকে ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত করে এনে ছিলেন। সেদিন এই রেসকোর্সে আমি বলেছিলাম, রক্তের ঋণ আমি রক্ত দিয়েই শোধ করতে প্রস্তুত। আমি বলে দিতে চাই আজ থেকে কোর্ট কাছারী, হাইকোর্ট, সুপ্রীমকোর্ট, আপিস, আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। কোনো কর্মচারী অফিসে যাবে না এ আমার নির্দেশ। গরীবের যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য রিক্সা চলবে, ট্রেন চলবে তবে সেনাবাহিনী আনা নেওয়া করা যাবে না। ... সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্টসহ সরকারী, আধাসরকারী এবং স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থাগুলো বন্ধ থাকবে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা যেতে পারবে না। বাঙালী বুঝে শুনে চলবেন, দরকার হলে সমস্ত টাকা বন্ধ করে দেওয়া হবে। আপনারা নির্ধারিত সময়ে বেতন নিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। বেতন যদি না দেওয়া হয়, যদি একটি গুলী চলে তা হলে তা হলে বাংলার ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। আমরা তাদের ভাতে মারবো – পানিতে মারব। আমি যদি হুকুম দেবার

জন্যে নাও থাকি, যদি আমার সহকর্মীরা না থাকেন, আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ কিছু বলবে না। সাতকোটি মানুষকে আর দাবাতে পারবা না। বাঙালীরা যখন মরতে শিখেছে তখন কেউ তাদের দাবাতে পারবে না। শহীদ ও আহতদের পরিবারের জন্যে আওয়ামী লিগ সাহায্য কমিটি গড়েছে। আমরা সাহায্যের চেষ্টা করবো। আপনারা যে যা পারেন দিয়ে যাবেন। সাতদিনের হরতালে যেসব শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করেছেন শিল্প মালিকেরা তাদের পুরা বেতন দিয়ে দেবেন। সরকারী কর্মচারীদের বলি, ...কাউকে যেন অফিসে না দেখা যায়। এদেশের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত খাজনা ট্যাক্স বন্ধ থাকবে। আপনারা আমার উপর ছেড়ে দেন, আন্দোলন কীভাবে করতে হয় তা আমরা জানি। বাঙালী অবাঙালী, হিন্দু মুসলমান সবাই আমাদের ভাই, তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র যদি আমাদের আন্দোলনের খবর প্রচার না করে তবে কোনো বাঙালী রেডিও টেলিভিশনে যাবেন না। ... আমার অনুরোধ প্রত্যেক গ্রামে মহল্লায় ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রামী কমিটি গড়ে তুলুন। হাতে যা অস্ত্র আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। মনে রাখবেন রক্ত যখন দিয়েছি আরও দেবো, তবু এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো।... এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। প্রস্তুত থাকবেন ঠাণ্ডা হলে চলবে না। আন্দোলন ও বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন, আন্দোলন ঝিমিয়ে পরলে তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, কারণ শৃঙ্খলা ছাড়া কোনো জাতি সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারে না।

মুজিবর রহমানের এই অগ্নিশ্রাবী ভাষণের পর থেকে ৮ই মার্চ থেকে সংগ্রাম সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছিল। ইতিমধ্যে বিদেশী নাগরিকেরাও ঢাকা ত্যাগ করতে শুরু করেছিল। ৮ই মার্চ লন্ডনে ১০ হাজারের বেশী প্রবাসী বাঙালী এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে পূর্ব পাকিস্তানের

স্বাধীনতার দাবী জানালেন। ৯ই মার্চ থেকে জেনারেল টিক্কা খান সামরিক আইন প্রশাসকের পদে নিযুক্ত হলে আন্দোলন ক্রমে জোরদার হতে শুরু করল। মানুষ যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা লাভের জন্যে বদ্ধ পরিকর হয়ে উঠেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারও চালিয়ে যাচ্ছিল চরম দমন নীতি। ১৬ই মার্চ ১৯৭১ স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল – "পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে তারা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, জোহা হল, মনুজান হল, যশোর এবং রঙপুর ক্যন্টনমেন্ট এলাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, ঢাকার ফার্মগেট ও কচুক্ষেত এলাকায় পাশবিক অত্যাচার চালায়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে অবশ্যই সমস্ত সৈন্য ফিরিয়ে নিতে হবে।"[৩১] পশ্চিম পাকিস্তানী সরকারের নৃশংসতা শিখর ছুঁয়েছিল ২৫ শে মার্চ রাতে। রফিক উল ইসলামের মতে, "পৃথিবীর জঘন্যতম গণহত্যার ইতিহাস।"[৩২] এই দিন ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সন্ধ্যায় অবাঙালী সেনাদের ডিউটিতে নিয়োজিত করেছিলেন। যে কোনো সময় কারফিউ হতে পারে আশঙ্কায় লোকজন দ্রুত ঘরে ফিরতে শুরু করলো। তবে গণহত্যার কথা কল্পনাও করা যায়নি। ২৫ শে মার্চ রাত ১১টা নাগাদ ঢাকায় সাধারণ মানুষের ওপর নৃংশস হত্যালীলা চালাতে পথে নেমে আসে সৈন্যবাহিনী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে নারী পুরুষ ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষকদের হত্যা করা হয়। শহরের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ অসামরিক জনগণকে বন্দুকের গুলীর সামনে নিহত করা হয়। শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এদিন। বিশ্ববিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী এক বস্তির মানুষদেরও নির্বিচারে হত্যা করা হয়। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বস্তিতে। ২৬ শে মার্চ মানবশূন্য রাজপথে কেবল সৈন্যদের চলাফেরা করতে দেখা যায় এবং রাস্তায় কোনো পথচারীকে দেখলেই তারা গুলী চালাতে থাকে। বিদেশী সংবাদিকদের দেশত্যাগ করানোর জন্য চাপ তৈরী করা শুরু হতে থাকে। নিরীহ

জনগণের বাড়িঘর দোকানপাটে আগুন ধরিয়ে দেওয়া শুরু হয়, বাঙালীদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই ভয়াবহ রাতের পর থেকেই শুরু হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ।

উপন্যাসে পশ্চিম পাকিস্তানি আর্মি নেমে এসেছে মানুষ খুনের ভূমিতে, বন্দুকের, কামানের গুলিতে তারা ধ্বংস করেছে ছাত্রদের। পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ তাজা প্রাণ মুহূর্তে বিনষ্ট হয়েছে খান সেনাদের গুলির আঘাতে। ইতিহাসের পাতায় দিনটি ছিল ২৫ শে মার্চ, বৃহস্পতিবার, ১৯৭১। ২৫ শে মার্চ রাতে শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের চূড়ান্ত মিটিং হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মিটিং হবার আগেই তিনি বিমানে করাচি পালালেন ও আদেশ দিয়ে গেলেন নিরস্ত্র বাঙালী নিধনের। রাতারাতি বদলে গেল বাংলাদেশের মানুষের জীবন, এক চরম ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা এসে গ্রাস করল তাদের। ২৫ শে মার্চের প্রথম আক্রমণের ঝোঁকে বাঙালীরা প্রচন্ড মার খেয়েছিল, কিন্তু তারপর ই পি আর এবং ছাত্র মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতিরোধে বেশ কিছু জায়গায় পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা মার খেয়েছে, ক্রোধে উন্মত্ত জনতা তাদের ছিন্ন ভিন্ন করেছে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী সরকারের মদত পুষ্ট, তাদের সামনে দাঁড়াতে পারা সত্যিই প্রায় অসম্ভব, তাই বার বার প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে, চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বোমা মেরে ধ্বংস করে দিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনী, যে সব গ্রামে মুক্তি যোদ্ধাদের ঘাঁটি ছিল সেই সব গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে, বাঙালী যুবক দেখামাত্র গুলী চালিয়েছে, যুবতী মেয়েদের নির্বিচারে ধর্ষণ করেছে, মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধ করতে গিয়ে মরেছে দলে দলে। উপন্যাসে বাংলাদেশের এই ভয়াবহ অবস্থায় নিজেদের বাঁচাতে মামুন চলে এসেছেন কলকাতায়। ভারতে অবস্থানকালে তিনি অংশ নিয়েছিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠনের কর্মসূচীতে। কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর

মহকুমার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার, অনুপস্থিত শেখ মুজিবর রহমানের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল রাষ্ট্রপতি হিসেবে। কলকাতায় পাকিস্তান ডেপুটি হাই কমিশন আনুগত্য দেখিয়েছিল নতুন সরকারের প্রতি, অফিসের নাম বদলে হয়েছিল বাংলাদেশ মিশন। বাংলাদেশের সবুজ সোনালি পতাকা উড়েছিল মাথা উঁচু করে।

উপন্যাসে জাহানারা ইমামও এসেছেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে জীবন্ত করে। তাঁর 'একাত্তরের দিনগুলি'র পাতা থেকে ঔপন্যাসিক জীবন্ত করেছেন তাঁকে। একটি শিক্ষিত উচ্চবিত্ত পরিবারের উজ্জ্বল সন্তান রুমী কীভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যুদ্ধের ভয়াবহ ভূমিতে। নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্ভীক সৈনিক হিসেবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কলমের বদলে হাতে তুলে নিয়েছে বন্দুক, চে গেভারার আদর্শ বুকে নিয়ে নেমে পড়েছে গেরিলাযুদ্ধের ভূমিতে। রুমীর মতই বহু তরুণ বহু যুবকের নির্ভীক স্বাজাত্যবোধ মুক্ত করেছে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ পীড়ন থেকে। ধর্ম নয় বড় হয়ে উঠেছে বেঁচে থাকার লড়াই, আত্মসম্মান রক্ষার তাগিদ, যে ধর্মকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ড থেকে পাকিস্তান ভিন্ন হয়েছিল সেই ধর্ম তাদের রাখতে পারল না একত্রিত করে। প্রমাণিত হল শোষক আর শোষিতের কোনো ধর্ম হয় না, কোনো জাত হয় না। মুক্তিযুদ্ধ সময়ের ভয়াবহতা, বাঙালী মুক্তি যোদ্ধাদের বীরত্ব, প্রাণ পণ করে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার বাস্তব সত্যকে সাহিত্যের সত্যে পরিণত করেছেন ঔপন্যাসিক।

পূর্ববঙ্গের এই ভয়াবহতার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের জীবনেও নক্সাল আদর্শ নিয়ে এসেছিল এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তা। উপন্যাসের ভৌগোলিক মানচিত্রকে ঔপন্যাসিক বিস্তার করেছেন এই খণ্ডে এসে। অতীন, তুতুল সহ আরও কিছু চরিত্রকে পৌঁছে দিয়েছেন পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে, ইউরোপ ও

আমেরিকায়। অতীন তার মার্ক্সবাদে দীক্ষিত মন নিয়ে প্রতি মুহূর্তে রক্তাক্ত হয়েছে ধনতান্ত্রিক দেশে তবুও ফিরে আসার পথ আর পায়নি, বিলাসবহুল স্থিত জীবনকে উপেক্ষা করে নেমে পরতে পারেনি অনিশ্চিতের আবহে। তুতুলের পরিচয় হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা যুবক আলমের সঙ্গে। দেশ যখন হিন্দু মুসলমান এই দ্বিজাতির ভিত্তিতে কাঁটাতারের বেড়ায় দ্বিখণ্ডিত পূর্ব ও পশ্চিমে, সেই সময়ে পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে মিলিত হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার দুই তরুণ তরুণী, ধর্ম কিংবা কাঁটাতার তাদের দ্বিধাবিভক্ত করতে পারেনি, তাদের মিলনের মধ্য দিয়েই ঔপন্যাসিক দুই বাংলার মিলনের যে স্বপ্ন তাঁর মনে চিরবহমান, সেই স্বপ্নকেই বাস্তব রূপ দিতে চেয়েছেন। চরিত্রগুলি নিজেদের আত্ম অনুসন্ধানের পথে নিরন্তর এগিয়েছে নিজের সত্তাকে রক্তাক্ত করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রবাসী বাঙালীরা বাইরে থেকে দিয়েছে সাহায্য, বিশ্বের দরবারে তারা খুলে দিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের ভয়ঙ্কর স্বরূপ, বিশ্বের কাছ থেকে তারা আদায় করেছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। শুধু অর্থসাহায্য বা মানসিক সাহায্যই নয়, বেনামে দেশে প্রবেশ করে তাদের অনেকেই প্রত্যক্ষ মুক্তি সংগ্রামেও যুক্ত হয়েছিলেন। উপন্যাসে আলমকে দেখা গেছে এই ভূমিকায়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সে লড়ে গেছে দেশের স্বাধীনতার স্বার্থে। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের চরম আত্মবলিদানের পথেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম নিশ্চিত হয়েছিল। পূর্ব বাংলা যে সময়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের নতুন পরিচয় গড়ে তুলতে জীবন পণ করেছে, সেই একই সময়ে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার অনেকগুলি বছর পেরিয়ে এসেও ভারতবর্ষ লড়াই করেছে বহুতর সমস্যার সঙ্গে। যদিও দেশে সমূহ সমস্যার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে ভারতবর্ষ সাহায্য করেছিল বাঙালী মুক্তিযোদ্ধাদের। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে নক্সালপন্থীদের উগ্রপন্থা প্রতিপদে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছিল প্রতি পদে, পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিল বহু তাজা প্রাণ। পুলিশের নির্মম দমন নীতি মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল নক্সাল আদর্শের।

উপন্যাসে আদর্শের পথে হাঁটতে গিয়ে যেমন শেষ রক্ষা হয়নি অতীনের, পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে তাকে পালাতে হয়েছে পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে, তেমনি আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে তরুণ তাজা কৌশিক-পমপমও হারিয়ে ফেলেছে জীবনের সমস্ত রসদ। নক্সাল আদর্শ যুবসমাজকে করেছে সর্বস্বান্ত।

সর্বোপরি বলা যায় 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসটি তার বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় জীবনের বহুতলীয় ভিত্তিকে উদ্ভাসিত করেছে। হিন্দু-মুসলিম এই দুই সমাজ তাদের বিচ্ছিন্ন জীবনে সুস্থিত হতে চাইলেও পারেনি। পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই বঙ্গ তাদের গতিশীলতার পথে প্রতি মুহূর্তে ভুল করেছে আবার শুধরে নিতে চেষ্টা করেছে নিজেদের। আবার পৃথিবীর দুই প্রান্ত তথা পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে থাকা মানুষ গুলো নিজেদের মনে যে পূর্ব ও পশ্চিম তার সুলুক সন্ধান করেছে জীবন ব্যাপী, একদিকে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা, ধ্বংস, মৃত্যু অন্যদিকে বাঙালী যুবকদের প্রবল আত্মসমর্পণ, নিজেদের অস্তিত্ব ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে প্রবল লড়াই তার মধ্যেও আছে পূর্ব-পশ্চিম, তথা একদিকে সদর্থকতা অন্যদিকে নেতিবাচকতার রক্তস্রোত। কমিউনিস্ট আদর্শের মধ্যেও আছে এই পূর্ব-পশ্চিম -এর দ্বন্দ্ব। আদর্শের দিক থেকে কানু সান্যাল, চারু মজুমদারের মতাদর্শ একটা সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখালেও তাঁদের ভ্রান্তিগুলো অচিরেই সামনে এসেছে। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সময় সন্ধানের পথে সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, জনগণ, থেকে ব্যক্তি মানুষ সমস্তটুকুরই পূর্ব-পশ্চিম সন্ধান করেছেন। প্রবহমানতার পথ তো আসলে এই পূর্ব-পশ্চিমের দ্বন্দ্ব আর বিবর্তনের পথ তো এগোয় যোগ্যতম হয়ে ওঠার লড়াইকে সঙ্গে নিয়েই, আর এই পথেই ঘটে উদ্বর্তন।

তথ্যসূত্রঃ

১। পৃ ৩১, অফুরান প্রাণশক্তিতে ভরপুর এক কথাশিল্পী, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, বইয়ের দেশ, জানুয়ারি – মার্চ ২০১৩, ৯ বর্ষ ১ সংখ্যা, সম্পাদক হর্ষ দত্ত, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ০১

২। লেখকের কথা পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৩। পৃ ১, কৃত্তিবাস পঞ্চাশ বছর, নির্বাচিত সংকলন(১ম খণ্ড), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯

৪। পৃ ৮৪, অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সপ্তম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৫। পৃ ১০, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৬। পৃ ১০, ১১ পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৭। পৃ ১৪৮, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৮। পৃ ৪৮, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৯। পৃ ৬, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

১০। পৃ ৬, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

১১। পৃ ১৯, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

১২। পৃ ৮৫, অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সপ্তম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

১৩। পৃ ৩১০, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা১৪

১৪। পৃ ৯২, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা১৪

১৫। পৃ ১১৯, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা১৪

১৬। পৃ ২০, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা১৪

১৭। পৃ ১১, ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য, অশ্রুকুমার সিকদার, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা ০৬

১৮। পৃ , পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা১৪

১৯। পৃ ৬৯, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা১৪

২০। পৃ ৬৮,পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা১৪

২১। পৃ ৬২, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

২২। পৃ ১৫৯, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

২৩। পৃ ২০১, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা১৪

২৪। পৃ ৪০৭, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা১৪

২৫। page 44, the Discovery of India, Jawarharal Neheru, Published in Penguine Books 2004

২৬। পৃ ৩০২, অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সপ্তম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

১৭। পৃ ৪৭০, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

২৮। পৃ ৫৫৮, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

২৯। পৃ ৫৫৮, পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৩০। পৃ , পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৩১। পৃ , পূর্ব-পশ্চিম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪

৩২। পৃ ৬১, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, অ্যা টেল অব মিলিয়নস, রফিক উল ইসলাম, দ্বিতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬, ছায়াপথ প্রকাশনী, ঢাকা ২